ঘোড়ার ঘাস কাটছি না

আজাদ আলম

“আম্মা, মান্না কই, ওকে যে দেখছি না”।

“ওকে কি আর বাসায় পাবে,বাবা। দেখ, কোন টো টো কোম্পানিতে চাকুরী নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, না হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার ঘাস কাটছে। কাজের মধ্যে তো এই দুই। কলেজে মারামারি হওয়ার পর এই যে কলেজ বন্ধ হল, খোলার নাম গন্ধ নেই। বাবুরও পোয়া বার। সকালে উঠে নাস্তাটা কোন রকম মুখে দিয়ে বের হয়ে যাবে। রাত বারটার আগে বাসা মুখো হবে না। সারাদিন হয় কোথাও বসে ঘোড়ার ঘাস কাটা, না হলে টো টো কোম্পানির ম্যানেজার হয়ে ঘুরে বেড়ানো। ওকে পারলে বিদেশে নিয়ে যাও বাবা”।

এ ছিল প্রায় এক যুগ আগের কথা। আদরের ছোট ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তায় শাশুড়ির মাথা ব্যথার শেষ ছিল না। শেষ মেশ মান্না স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে সিডনিতে আসে।

আসার দুদিন বাদেই মান্না কাজ খুঁজতে শুরু করল বেশ উৎসাহের সাথে। কাজ করে হাত খরচ, টিউশন ফি যোগার করতে হবে, তার আপার পাঁচ commandment এর শীর্ষ আদেশ এটা। চাকুরী মিলল কিংসফোর্ডের কৃষ্টল কার ক্লিনিং ইয়ার্ডে। প্রথম চাকুরী, মান্নার খুশি খুশি মেজাজ। পকেটে কড়কড়া কিছু ডলার আসবে। দেশের বন্ধুদের ফোন করে বলবে, “তোরা আছস কই, আমি এখন ডলার কামাই”।

সকাল ৮ টায় কাজ শুরু, বিকাল সাড়ে চারটায় শেষ। মাঝে ২০ মিনিটের লাঞ্চ ব্রেক ছাড়া আর কোন দম ফেলার সময় নাই। মান্নার কাজ গাড়ির ভেতরটা ভ্যাকুম করা। তিন মিনিট সময়। এর মধ্যে গাড়ির ভেতর পরিষ্কার করে, র‍্যাগ দিয়ে ড্যাসবোর্ড, দরজা ইত্যাদি মুছে সুগন্ধি স্প্রে মারতে হবে। সময় বেশি নিলেই, মুভ ইয়োর এ্যাস ফার্স্ট, হারি আপ প্রেটি ফেস ইত্যাদি গালিগালাজ। পরের গাড়িটা মান্নার কাছে আসার জন্য স্টার্ট দেয়াই আছে, ঘোঁত ঘোঁত করছে এক্সিলারেটরের চাপ খেয়ে। গাড়ি থেকে বের হয়ে কোমর সোজা করার সময় নাই, আর একটা গাড়ি এসে হাজির। আবার কোমর বাঁকা করে মাথা গাড়ির ভিতরে ঢুকিয়ে ময়লা শোষণ কর্মে লিপ্ত।

আমি যখন আনতে গেলাম তখন চারটা বাজে বাজে। ওর অবস্থা দেখে চোখ আমার ছানাবড়া। কপাল ঘেমে জবজবা। ঘাম মোছার সময় নেই। দুধে আলতার ফর্সা চেহারা লাল টকটকে হয়েছে। রোদ, লজ্জা আর বিরামহীন কাজের ত্রিশূল আক্রমণে। নতুন জিন্সের প্যান্ট, কলারেডোর টি সার্ট আর নাইকীর কেডস একদিনের ব্যাবহারেই ফেলে দেয়ার মত অবস্থা। যে ছেলেটাকে অনায়াসে লেবানিজ বা ইতালিয়ান বলে চালিয়ে নেয়া যায় (নির্ভর করে তার চুল ছাটার স্টাইলের উপর) তার এই দুর্দশায় আমার চোখে পানি আসল।

ক্যামন ছিল কাজ বলেই ঠোঁটে কামর দিলাম। অবান্তর প্রশ্ন। চেহারাই বলে দিচ্ছে ক্যামন গেছে ওর দিন। অফিসে গিয়ে মজুরি আনতে বললাম বেশ নরম গলায়।

ওর বিরক্তির স্বরে উত্তর, “আরে চলেন তো দুলাভাই, আপনি এসে নিয়েন, টাকাটা নিজের পকেটে রেখে দিয়েন”।

সারা রাস্তায় আর কোন কথা বলে নাই মান্না। পরদিন সকালে তার হাত পা ফুলা দেখে তো ওর আপা গাল ফুলে বসে আছে । আদরের ছোট ভাইটিকে এমন কষ্টের কাজ যোগার করে দিলাম কেন? মান্না কাজে তো নয়ই, সত্যি সত্যি বেতন আনতেও কৃষ্টল কার ক্লিনিং ইয়ার্ডে যায় নি। পরে আমাকেই ওর জীবনের প্রথম মজুরিটা উদ্ধার করতে হয়েছে।

পরের কাজটাও তেমন সুখের ছিল না। গলফ খেলার বল কুড়ানো। প্রাকটিস ফিল্ডে গলফ টি অফ করার অনুশীলন চলে এবং খেলা শেষে সে সব বল কুড়িয়ে আনতে হয় গলফ বাগি চালিয়ে। কাজটা এখানেই শেষ হলে ভালই ছিল। সেগুলো পানিতে পরিষ্কার করে, বালতি বালতি সে সব ভারী বল ঝুলন্ত লোহার জালে শুকোতে দেয়া। পরের দিন সকালে আবার গুনে গুনে বালতিতে রাখা। এতে বল হারিয়েছে প্রমাণ হলে, কোরিয়ান মালিকের ভাঙ্গা ইংরেজিতে নোংরা গালি শুনতে হয়। মান্নার কানের পর্দা বেশ সেন্সেটিভ। যুবক বাঙ্গালীর মর্যাদাবোধ বেশ টনটনা। সে কাজটাও মান্না বেশিদিন ধরে রাখতে পারে নি।

মান্না আসার বছর দুয়েক পরেই আম্মারা বেড়াতে আসেন সিডনিতে। বলতে গেলে ছোট ছেলেকে দেখতেই।

এক রোববারের সকাল বেলা। আম্মা মান্নাকে ডাকছে,

“বাবু, বাবু, বাবু কই। “নাস্তা খাবে না ও”।

মান্নার আদুরে নাম বাবু। একমাত্র আম্মাই মান্নাকে ‘বাবু’ বলে ডাকে। আবার রাশভারী আম্মাকে একমাত্র মান্নাই ‘তুমি’ করে সম্বোধন করে। বাকি ছেলেমেয়েরা ‘আপনি’ বলেন।

বললাম, “আম্মা, ও তো ঘাস কাটতে গেছে, ঘোড়ার ঘাস, এখনই চলে আসবে।”

আম্মা বুঝে উঠতে পারলেন না, আমি মশকরা করছি কি না। না বোঝার ভান করে বলল, “এত সকালে বাইরে যাওয়ার কি দরকার ছিল। আগের অভ্যাস টা তার গেল না। এখানে এসেও ঘোড়ার ঘাস কাটা”।

বলতে না বলতেই বাবু বাসায় ঢুকলো পেছন দিক দিয়ে। আম্মা চা নিয়ে বাইরের বারান্দায় বসা। মান্নার জিন্সের প্যান্টের গোড়ালিতে সবুজ ঘাসের গুড়ো টুকরো লেগে আছে। আম্মা তো দেখে একেবারেই থ । “হ্যাঁরে বাবু, তুই কি সত্যি সত্যি ঘাস কাটতে গিয়েছিলি এত সাত সকালে”?

“হ্যাঁ আম্মা, ঘোড়ার ঘাস কেটে আসলাম, ক্যাশ পয়সায়। এ ঘাস প্যাকিং হয়ে চলে যাবে মেলবোর্নে। আসন্ন মেলবোর্ন কাপের ঘোড়াগুলোর পেটে যাবে সে ঘাস। তোমরা বিছানা থেকে উঠার আগেই আমি পঞ্চাশ ডলার কামাই করে নিয়ে আসলাম, যা আমার সারা সপ্তাহের হাত খরচ”।

আম্মা হতবাক। নিশ্চুপ। মনে পড়ে গেছে হয়ত: দেশের বাড়ীর কাজের ছেলে কালুর কথা। গাভীর জন্য ঘাস কেটে আনতো। সে দৃশ্য ওনার চোখে ভাসছে এখন। দূর্বা ঘাস খেলে গাভী দুধ বেশি দেয়, এ ঘাস কেটে আনার জন্য কতই না কালুর হাতে পায়ে ধরতে হত আম্মাকে। তাই বলে আদরের ছেলে.....। মধ্যবিত্ত পরিবারের সম্মান সচেতন মহিলা ভেবে কুল পায় না। কি দরকার এই ছাতার ছোট মোটো চাকুরী করার।

আমার স্ত্রী বোঝানোর চেষ্টা করল আম্মাকে, “কাজের কোন বড় ছোট নেই। সৎ কাজে লজ্জা কিসের। এখানে সবাই সব কাজ করে। নিজের কাজ আর অন্যের কাজের পার্থক্য শুধু অর্থের লেন দেনের। এই যে সারাদিন বাসার সব ধরনের কাজ করি, এই কাজ অনেকে বাইরে করে বাড়তি কামাইয়ের জন্য, স্টুডেন্টদের করতেই হচ্ছে এসব কাজ। কাজ কাজই। আমাদের নবীজী ত কাঠ কেটেছেন, মেশ চড়াতেন, আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) টুপি সেলাই করতেন, মহাত্মা গান্ধী চরকায় সুতা কাটতেন। তাদের মান কখনই ক্ষুণ্ন হয় নি। আমেরিকার বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন মাঠে কাজ করতেন, লোহার বেড়া বানাতেন”।

আম্মার কানে সে সব সান্ত্বনা বাণী কতটুকু গেল জানি না, ওনার চেহারা গাম্ভীর্যে ভরা থাকে এমনিতেই। সবচেয়ে আদরের ছোট ছেলের এই “কালু কিসিমের” কাজ হজম করতে কষ্ট পাচ্ছে। মুখের আদল কালো মেঘে আচ্ছন্ন। মেয়ের এ সব নীতি কথায় মায়ের মন শান্ত যে হয় নি, এটা টের পেলাম সিক্তপ্রায় চোখে এসব কথায় নিরাসক্তি দেখে।

বড় আদরের ছোট ছেলে যে বিদেশে এসে সত্যিকার অর্থেই ঘোড়ার ঘাস কাটার চাকুরী করে মো মো লন মোয়িং কোম্পানিতে, ক্যামন যেন পীড়াদায়ক ব্যাপার। মালিক মারিও কস্টাক্যাটিস সাদা চামড়ার লোক। ক্যামন মেজাজ কে জানে। বাবুকে গালাগালি করে না তো! আমি যেমন কালুকে বকাবকি করি। এ রকম নাজুক চিন্তায় বেশ কয়েকদিন অস্বস্তিতে ভুগলেন আম্মা। চিন্তা রোগের উপশম হোল, যেদিন মান্না মারিওর বাসায় বেরাতে নিয়ে গেলেন আম্মাকে। বাসার প্রতিটি ইঞ্চি এত সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো গোছানো, দেখেই আম্মার চোখ জুড়িয়ে গেল। আলমারি ভরা এন্টিক সুভেনির আর বইপত্রে। ব্যাক-ইয়ার্ডে বাসার সামনেটার মতই নানান ধরনের ফুলের টব এবং বাহারি পাতা গাছে শৈল্পিক ছোঁয়ায় সাজানো। আম্মা বলে ফেললেন, ঘাস কাটলে কি হবে, বুড়োর খাস খান্দানি রুচি।

মারিওর বাসার ডাইনিং টেবিল সাজানো হরেক রকম গ্রীক নাস্তা দিয়ে। নাস্তার বড় উপকরণ ছিল চিজ ক্রাকার বিস্কিটস ইত্যাদি। টেবিলে বসে অনেক গল্পই করল মারিওর মা এবং মারিও নিজে। মান্নার প্রশংসায় মারিও এবং মারিওর মা সিলভিয়া পঞ্চমুখ। মান্না রাজি থাকলে নিজের নাতনীর সাথে বিয়ে দিতেও প্রস্তুত ছিল সিলভিয়া।

৭০ এর কাছাকাছি মারিওর বয়স। পঞ্চাশ বছর আগে সাত সমুদ্দুর তের নদী পাড়ি দিয়ে, গ্রীস থেকে আসে অস্ট্রেলিয়ায়। শ্রমিক পরিবারের ছেলে মারিওর পড়াশোনা বেশি দূর এগোয় নি। মারিও কস্টাক্যাটিসের যৌবন কেটেছে বড় কষ্টে। পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে মারিও দুই নম্বরে। বড় ভাই আন্তোনিও গ্রীসেই থেকে গেছে। দীর্ঘদেহী মারিও বাপের সাথে মাইনিং এ কাজ করেছে অনেকদিন। হাসিমুখে মেনে নিয়েছে খনিতে কাজ করার শারীরিক জ্বালা যন্ত্রণা। বাবাকে হারায় মাইনিং এক্সিডেন্টে। নিজে অল্পের জন্য বেঁচে যায়। সেই ভয়াবহ মাইনিং ধসের বিভীষিকাময় স্মৃতি এখনও পরিষ্কার মনে আছে। সে কাজে আর ফিরে যায় নি। পরে বোটানি পোর্টে চাকরি নেয় ফর্কলিফট চালানোর। তখন ২২/২৩ বছর বয়স। এই বয়সের অন্যান্যরা যখন নতুন হাই স্পিড গাড়ী, গার্ল-ফ্রেন্ড আর গান বাজনা নিয়ে হৈ হুল্লোড় থাকে, সে বয়সে মারিওর কাঁধে সংসারের জোয়াল। পোর্টের চাকরির সাথে সাথে লন ময়িং এর কাজ করত বলতে গেলে ফুল-টাইম। যৌবন কালের কষ্টের ফসল ৮০০ স্কয়ার মিটার জায়গায় হাই স্ট্রীটের উপর এই সুদৃশ্য প্রাসাদ। এখানে জন্ম দুই ছেলে আর মেয়ের। সবাই শিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত। ইচ্ছে করলেই মারিও বসে শুয়ে দিন কাটাতে পারে কিন্তু তার চিন্তাধারা অন্যরকম। পয়সার জন্য শুধু না, কাজে থাকা মানে আমি সমাজের বোঝা না এই বোধ থেকে এখনো কাজে আছে। ঘাস কাটার কাজ। কি চমৎকার ফিলসফি। ও বলত, আমি গ্রীক ফিলসফি বা মিথলজি বুঝি না, বুঝি ফ্যামিলি ফিলসফি এবং প্রোডাকটিভ সাইকোলজি। সুস্থ থাকুন এবং সুস্থ শরীরকে কাজে

লাগান। নিজের এবং সমাজের। মারিও বৃদ্ধা মাকে এখনও বুকে জড়িয়ে রাখে। ৫ সন্তানের পরিবারের খেটে খাওয়া মা সমান তালে কষ্ট করেছে বাবার মত, সাত সকালে বাবার সাথে যখন কাজে যেত, দুই বাটি গরম দুধ রেডি থাকতো টেবিলে। মাইনের কাজ থেকে ফিরে আসলে রাতের খাবার টেবিলে সাজানো দেখতো । মা যেন কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে অথচ মা নিজেও একটু আগে ব্রেড ফ্যাক্টরির গরম চুলা থেকে ছাড়া পেয়ে বাসায় এসেছে। বড় ভাইকে প্রতিবছর নিয়ে আসে দেশ থেকে। সমস্ত খরচ মারিও দেয়। সে সমটা বাসায় মহা উৎসব লাগে। সব ভাইবোনেরা জড় হয় মায়ের বিশাল ঘড়ের কিং সাইজ বিছানার চারপাশে। সুখ দুঃখের কতই না স্মৃতি চারণ করেন মা।

আম্মা বিদেশী একটা পরিবারের কাহীনি শুনে নিজের জীবনের সাথে মিল খুঁজে পান। মনের অস্বস্তিকর দ্বন্দ্বটা কেটে যায়। সাদারাও আমাদের মত সুখে দুঃখে মানুষ। কালো, সাদা বাদামী রঙ শুধু পিগমেন্টের কারণে। ধমনীতে সবার লাল রক্ত প্রবাহিত হয়। সে রাতে আম্মার ভাল ঘুম হয়েছিল নির্ঘাত। কখন ভোর হয়েছে, মান্না আবার ঘাস কাটতে বের হয়ে গেছে টের পান নি। ফজরের নামাজের কাযা আদায় করতে হয়েছে।

কদিন আগে তৃতীয় বারের মত বেড়াতে আসলেন আম্মা। প্রধানত: ছোট ছেলের সংসার দেখতে আসা। বাবুর সংসারে এক ছেলে এক মেয়ে। বাসা কিনেছে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মত মানুষ করা, ভাল বিয়ে শাদী দেয়া বা ভালো চাকুরী করাটা যেমন সাফল্যের মাপকাঠি ঠিক তেমনি ছেলেমেয়েদের নিজের বাসা বাড়ী থাকাটাও বিরাট বড় অর্জন। ৭০০ শ স্কয়ার মিটারের উপরে জমির আয়তন। বেশির ভাগটাই খালি। ঘাস কাটতে হয় প্রায়ই। আম্মা ছেলের সংসার দেখে ভীষণ খুশি। ছেলে বউ দুজনেই ভাল চাকুরী করে। উপরন্তু সরকারি চাকুরী, আম্মার কাছে এর কদরই আলাদা। ইনভেস্টমেন্ট প্রোপার্টিও এর মধ্যে কিনেছে, বউমা বেশ বৈষয়িক। তবে তাদের ব্যস্ততার শেষ নেই।

সেদিন শনিবার ছিল। সকালেই বাজার হাট সেরে লন মোয়ার নিয়ে ঘাস কাটতে নামলো মান্না। আম্মা নাস্তা খেয়ে, চা নিয়ে বারান্দায় বসেছেন। মান্না ঘাস কাটছে নিজের মনে। ছেলের নিজের জমির ঘাস । মায়ের এখনকার অনুভূতি একযুগ আগের অন্যের জমির ঘাস কাটা থেকে ১৮০ ডিগ্রী বিপরীতে। মা এর মন বেশ ফুরফুরে, মুচকি হাসি মাখা মুখ। এত বড় ব্যাক-ইয়ার্ড থাকলে তো ঘাস কাটতে হবেই।

কৌতুক মাখানো স্বরে আম্মা বলেই ফেললেন, “হ্যাঁরে বাবু, তোর ঘোড়ার ঘাস কাটা চাকুরী আর গেল না”।

মান্না মায়ের কৌতুক মাখা গলার স্বর বুঝতে পারে, হাসি চেপে রেখে মায়ের দিকে না তাকিয়ে উত্তর দেয়,

“ঘোড়ার ঘাস কাটছি না, আম্মা। ঘোড়া খায় বারমুডা ঘাস, কেন্টাকি ঘাস। আমারগুলো বাফেলো ঘাস মানে মহিষের ঘাস, এগুলো ঘোড়া খায় না”।